পুণ্যিপুকুর

জয়া মিত্র

সাতদিন বৃষ্টি পড়ছে সাতরাত বৃষ্টি পড়ছে
ও সুন্দর মেয়েরা তোমরা কোথায় ছিলে?
সাতদিন বৃষ্টি পড়ছে সাতরাত বৃষ্টি পড়ছে
আমরা ছিলাম পাহাড়ের মাথায় বড় বড় ফুলের নীচে,
বৃষ্টির জল জমে বড় বড় ফুলে পুকুর হয়েছে
(সাঁওতাল গান)

ছোটবেলায় একটা খুব প্রচলিত খেলাছিল— কয়েকজন ছেলেমেয়ে হাত ধরাধরি করে একটা ছেটে ঘেরা তৈরিকরে দাঁড়াত, অবশিষ্ট একজন পাশ দিয়ে , দৃশ্যত যেমন-তেমন ভাবে হেঁটেযেত। গোল হয়ে দাঁড়ানো দলটি সমস্বরেডেকে উঠত— রাজামশাই,রাজামশাই, কোথায় যাচ্ছ ?

ফলে সে হয়ে উঠত রাজামশাই আরবাকি খেলুড়েরা হতো পুকুর। অতঃপর তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত রকমের কথা চালাচালি হতো—

—চানকরতে যাচ্ছি
—এইপুকুরে চান করো
—নাঃএটা বড্ডো ছোট
—একটাঢিল ফেলে দাও, বড় হয়ে যাবে

রাজামশাইসেইমত একটা ঢিল তুলে পুকুরের মাঝখানে ফেলবেন আর সঙ্গে সঙ্গে পুকুরেরআয়তন বড় হয়ে অনেকখানি ছড়িয়ে পড়বে। যেকোন জায়গায় হাতে হাত বাঁধা সেই ঘেরা খুলে রাজামশাই স্নানকরতে ঢুকে পড়বেন। এরপর কী কীহবে সে সব কথা এ খেলা যাঁরা খেলতেন তাঁরা সবাই জানেন। বাকিরা না হয় রইলেন রহস্যেই। কিন্তু আমাকে ভাবাচ্ছে অন্যকথা।

প্রাসাদ ছেড়ে রাজামশাই স্নান করতে পুকুরে যেতেন কেন? যদি বা যেতেন, ছোটপুকুর বলামাত্রইতাকে বড় করে দেবেন? সকলেই জানেন,বাচচাদের খেলা, প্রথাগত পুরোন খেলা পুরোন কিছু কিছু সামাজিকব্যবস্থার স্মৃতি বয়ে আনে। এরকম আরও কিছু কিছু লোককথা আছে যেখানে চাষীটি সারাদিনেযতোটা জমি চক্কর দিতে পারল রাজা গ্রামে ততো বড় দীঘি কাটিয়ে দিলেনকিংবা কাটাপুকুরে জল উঠছে না দেখে শেষ পর্যন্ত রাজকন্যা বা স্বয়ং রানী আত্মবিসর্জনের প্রতিজ্ঞা করেপুকুরের গভীরতম জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন, তখন সেইখান থেকে জল উঠল । কিংবা — আলুপাতা ঠালুপাতাবিন্নাপাতা কেশ / নয়ারাজারদীঘি দিছে পুবে তাহার দেশ (খেলার ছড়া/ঢাকা)।

এসব গল্পগাথা, ছড়া, খেলা একটাব্যাপার স্পষ্ট নির্দেশ করে— পুকুর দীঘি বা অন্যান্য জলাশয় তৈরি ওরক্ষণাবেক্ষণ করাটা সমাজের ক্ষমতাসীনলোকেদের কর্তব্যের মধ্যেপড়ত। কোন শুভ ঘটনা বা শোকস্মৃতিকে লোকমানসে স্থায়ী করতে পুকুর-দীঘি, কাটিয়ে উৎসর্গকরতেন সম্পন্ন গৃহস্থেরা। দূরঅতীতের ভূস্বামীদের নিজেদের রাজনগরগুলির সৌন্দর্য্য ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্যওদীঘি কাটাতেন। কোচ বিহারেরসাগরদীঘি, বর্ধমানের শ্যামসায়র-কৃষ্ণ সায়র,

বহরমপুরের লালদীঘি,মুর্শিদাবাদের মোতিঝিল, বিষ্ণুপুরের লালবাঁধ অধিকাংশ পুরোন শহরেইআছে এরকম ঝিল কি দীঘি। এরঅধিকাংশই অযত্নে অবহেলায় নষ্ট হতে বসলেও কিছু এখনো বেঁচে আছে। এখনও তাদের জল মানুষ-পশুপা খিরপ্রয়োজন মেটায়।

পঞ্চাশ , ত্রিশ কি বিশ বছর আগেওগ্রামশহরের মানুষের জীবনের সঙ্গে পুকুরের সম্পর্ক ছিল খুব ঘনিষ্ঠ। কতো আগে থেকে যে সে ঘনিষ্ঠতার শুতার নির্ণয় করা সহজ নয়। মনে হতেপারে ভারতের পূর্বাঞ্চলে এই নরমমাটি আর মাটি ধরে রাখাঅরণ্যকুন্তল রাজ্যে মানুষের বসবাসেরও আগে থেকেই বোধ হয় পুকুরছিল। প্রকৃতির নিজের হাতেতৈরি জল াশয় ছিল হয়ত সেসব, বৃষ্টির গড়িয়ে যাওয়া জল কিংবা বর্ষায় নদীউপচানো জল যেসব খানাখন্দরে জমা হত সেগুলোই আদি পুকুর। মানুষ ছিল না তখন, জঙ্গলের জীবজন্তুরতেষ্টা মেটাবার ভাণ্ডার ছিল সেইসব পুকুর। ভিজে ভারী বাতাসে গ্রীষ্মের রৌদ্রউজ্জ্বল আকাশের নিচ দিয়েতীক্ষণস্বরে ভেঙে যাওয়া পাখি, তাপক্লান্ত পশুদল দিনের শেষে বা দিনের শুতে বনতলের কিংবামধ্যপ্রান্তরের সেইসব পুকুরের ধারে জমা হত। সেই জলাশয়গুলিই হয়ত প্রথমমানুষদের শিখিয়েছিল জল ধরে রাখবার সবচেয়ে সহজ কার্যকরী এই প্রকৌশল। ঊনিশ শ সাতচল্লিশ সালের স্বাধীনতার সময়ে বাংলাদেশে পুকুরের সংখ্যা ছিলপাঁচলক্ষের মত। মৌসুমী বর্ষার ধারা ওই পাঁচলক্ষকলসে জমা হয়ে মাটিকে মরম রাখত সারা বছর । এমনকি বন্যাও আসত মীনকল্যাণী হয়ে। ক্ষেতে ক্ষেতে পলি ছাড়াও পুকুরে দিয়ে যেত মাছেরফসল। তবে তো ব'রম্ভঅ পত্ত'াকরে 'ওগ্গর ভত্তার সঙ্গে' মোইলি মচ্ছা, নালিঞ্চ গচ্ছা' জুটত'মাছে ভাতে' বাঙালির পুণ্যবাণ পাতে।

এই যে সংখ্যাতীতদীঘি-পুকুর-জলাশয়-বাপী-তড়াগ-তাল-পল্বল, কোথা থেকে তৈরি হয়েছিল এসপব? কারা খুঁড়ত ? কী ছিল সেসব নিয়মকানুন? জায়গা বাছা হত কেমন করে ? কার জমি? কে দিত পুকুর খুঁড়তে? সবাই কি করত পুকুর খোঁড়ারকাজ নাকি থাকত কোন বিশেষ গোষ্ঠীর লোক? এসব প্রশ্নের কোন সরাসরি উত্তর আমরা পাই ন া। কোনো বইয়ে আলোচিত হয়নি সেকথা। বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের লোকদের জিজ্ঞেস করেছি কি নিয়ম ছিলপুকুর খুঁড়বার ? স্পষ্ট গোছানোউত্তর পাওয়া যায়নি। কিন্তু যখন কথাউঠেছে পুকুর ধারে কী গাছ লাগানো ভালো আর কে ানটা ভালো নয়, কিংবাঢাল জমিতে পুকুর কাটা ভালো না কাদাজমিতে তখন বিভিন্ন বয়স্ক মানুষদেরকাছে সটান জবাব অ াছে তার। সকলেরকাছে নয়, কারো কারো কাছে, কিন্তু কার কাছে যে জানা যাবে সেকথাপ্রায় সবাই জানেন। এ থেকে অনেকগুলোধারণা পরিষ্কার হয় ।

পুকুর কাটবার কিছু নিয়মাবলীপুরোন বাস্তুশাস্ত্রে, কিংবা গৃহ্যসূত্রে যে নেই এমন নয় কিন্তু সেগুলি হলপ্রথামত প্রতিষ্ঠা করা পুকুর। তথ্যতিরিক্ত যে অগণন জলাশয়সেগুলি কাটবার বাস্তবজ্ঞান কোথাও বর্ণিত নেই। হয়ত এটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক। নানান ব্যঞ্জনের পাকপ্রণালী বইয়ে লেখা থাকে, শেখানোর ব্যবস্থা হয়,ভাত রান্নার পদ্ধতি কোথাও আলাদা করে বলা হয় না তো। ভাতপ্রতিটা রান্নাঘরেই রান্না হয়, লোকে স্বাভাবিকভাবে দেখে দেখে শেখে,অথবা মুখে মুখে জল আর চালের মাপ বলে দেওয়া হয়। দেশে এত পুকুর ছিল, পুকুর কাটা ও তার রক্ষণাবেক্ষণকরা এত বহুপ্রচা রিত ছিল যেআলাদা করে তা লিখে রাখা নিশ্চয়ই বাহুল্যমনে হয়েছিল। ওই বিষয়ের ব্যবহারিকজ্ঞান চর্চিত হত মুখে মুখে। বাহিত হয়েআসত শ্রুতিতে।

শ্রুতিবাহিত জ্ঞানের বিশেষত্ব এই যেকালানুক্রমে কোন দীর্ঘ ছেদ ঘটলে তার পারম্পর্য ছিন্ন হয়ে যায়। গত কয়েক দশকে গ্রামাঞ্চলে হয়েছে তা ছিলসরকারি রিলিফের 'ফুড ফর ওয়ার্কের' কাজ। সেখানে জনপদের অধিকাংশ লে াক যোগ দিতঠিকই কিন্তু পরম্পরাগত যেসবরীতি নিয়ম তার বেশিরটাই মানা হত না।ফলে সেই জ্ঞান প্রায় হারিয়ে গিয়েছে। গ্রামের যে মানুষরা সেসব জানতেন তাঁরা কলনির্ভরতার চাপেনিজেদের জ্ঞানকে মূল্যহীন ভাবতে শিখেছেন। অথচ সারাদেশে এবং আমাদের রাজ্যেও জনসংরক্ষণের পরম্পরাগতকাজের যেসব নমুনা পাওয়া যায় তার কার্যকারিত া, জটিল সমস্যা সমাধানেরঅতি সরল উপায়, অর্থনৈতিক সাশ্রয়ব্যবস্থা দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় ব াংলাদেশেভিটে বাড়ি তৈরির একটা ছড়া মুখে মুখে প্রচলিত ছিল— পূর্বেহাঁস, পশ্চিমে বাঁশ। অর্থাৎ পুকুর হবেবাড়ির পূর্বদিকে। কেবল যে পূবদিককে সূর্যের দিক বলে শুভ ধরা হয়তাই নয়, সকালের রোদ জলকে পরিষ্কার ও জীবন্ত রাখে। বাড়ি তৈরির সময়ে একটি দিক পুকুরেরজন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়ার অর্থ — প্রতিটি বাড়িরই নিজস্বপুকুর থাকবে এটা ধরে নেওয়া হত। বাংলার গৃহস্থালিতে অনেক সাধারণ গৃহস্থ বাড়িতেওএকাধিক পুকুর থাকত— মেয়েদের আলাদা

খিড়কিপুকুর বানাছ্পুকুর, শৌচের জন্য আলাদা ডোবা মানভূমে যাকে বলে গড়্যা। আবারপানীয় জলের জন্য গ্রামে গ্রামে ঘড়া কাঁখে মেয়ে বৌদের ক্রমাগত হাঁটতে থাকাওসত্যি। সমস্ত বাস্তব সম্পদের মত জলেরও অধিকার বেশি পেত সবর্ণ অথবাসমৃদ্ধজনেরা। আর্থ সামাজিক দুর্বলতরশ্রেণীকে নির্ভর করতে হত ক্ষমতাশালীদের ইচ্ছা বা বিবেচনার ওপর। তা সত্বেও, কয়েক দশক আগে পর্যন্তএকদিকে রাষ্ট্রব্যবস্থার এমন সর্বব্যাপী কেন্দ্রীকরণ হয়নি অন্যদিকেবাইরে থেকে আমদানি করা দুর্মূল্য জ্ঞান প্রযুক্তিবিদ্যা ও যন্ত্রপাতি আমাদেররাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার এতখানি ভিতর পর্যন্ত চারিয়েযেতে পারে নি, যেমন এখন পেরেছে। ফলে সমাজে মানুষের পারস্পরিক নির্ভরতা, যৌথতা ছিল অনেকবেশি। নিরালম্ব আত্মোন্নতির দর্শন অভ্যাস করা এতো সহজ ছিল না ।

বিভিন্ন পুকুর দেখে, এদেশেরঅন্যান্য অঞ্চলের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করে, নানাজনের থেকে মুখেমুখে নানা কথাশুনে পুকুর কাটা সম্পর্কে যে ধারণা আমাদের মনে গড়ে উঠেছে সেটিসর্বোপরি একটি যৌথ কাজের প্রতিমা।

কিংবদন্তীজানে সেই বুড়োটির কথা, যে এখনো
খরায় জড়ানো দিনেমাটির আঘ্রাণ নিতে নিতে
বলে দিতে পারে বুকে কোনখানে জমে আছে জল
সমস্ত গাঁয়ের লোক তার শীর্ণ চোখে চেয়ে থাকে
সেই বুড়ো মরে গেলে পৃথিবী অনাথ হবে নাকি?

মাটিতে গাছের ডাল ঠুকে, কখনও বা মাটি শুঁকেকেউ কেউ বলে দিতে পারতেন সেখানে কুয়ো-পুকুর খুঁড়লে জল উঠবেকি না — একথা হয়ত পুরোপুরি বিশ্বাস হত না। তারপর স্বচক্ষে দেখেছি রাজস্থান-গুজরাট গ্রামাঞ্চলের সেইসব অভিজ্ঞ বয়স্ক মানুষদের যাঁরা কোনো মাঠেরদিকে একটুক্ষণ চেয়ে থেকেই বলে দিতে পারেন কোন্ দিকে কতখানি তার ঢাল । গড়িয়ে যাওয়া বৃষ্টির জল আটকাবারজন্য এই জানাটা খুবই দরকার হয়। গজের মাপ যেন এঁদের মাথার মধ্যেই ধরা আছে— এই অর্থে গ্রামসমাজএঁদের সম্মান জানায় গজধর বলে। সেঅঞ্চলেও পুকুর খোঁড়ার জন্য প্রথম আবশ্যিক কাজটা এঁরাই করেন। এখানে একটা কথা খেয়াল রাখবার। আমরা বলি পুকুরগুলি বর্ষার জল জমারাখার কলস। ঠিকই, কিন্তু সেটাই সম্পূর্ণ নয়। একাধিক উপাখ্যানে, রীতিতে, সংস্কারে পুকুরের নিচ থেকেজল ওঠার উল্লেখ পাওয়া যায়, অর্থাৎ ভূমিজলের স্রোত পুকুরের নিচ দিয়ে উঠে আসত। পুলিয়ার বিশাল বড় সাহেব বাঁধ সম্পর্কে কিংবদন্তী যে ওইজলাশয়ের 'নিচে নদী আছে'। যেসব দীঘি-পুকুরের জল কখনও শুকোয় না, খরার দিনেও তলারকাদা দেখা যায় না তাদের সকলেরইওরকম 'নিচে নদী আছে' বলে ধরে নেওয়া যায়। সে অর্থে ওই পুকুরগুলির কেবল বৃষ্টিজলেরকলস নয়, স্থির ঝর্ণাও। ভূতলস্থ জলের স্রোত মাটির নিচে ঠিক কোনখানে পাওয়াযাবে, মাটির ওপরের বিভিন্ন সূক্ষন লক্ষ্মণ বিচার করে সেকথা বলেদিতে পারতেন এই 'জলখুঁজিয়া'রা। এমনকি মাটি শুঁকেও এঁরা জলের খবর বলতে পারতেন বলেএঁদেরকে 'জলসুঁখা' ও বলা হত । রাজস্থান,গুজরাটের বালুকাময় পশ্চিমাঞ্চলে কোথাও কোথাও স মুখঅলা একরকম ছোটছোট কুয়ো দেখা যায়, তাকে বলে কুঁই অর্থাৎ কুয়ো, সাধারণভাবে মভূমিঅঞ্চলের বালি সমস্ত জল শুষে ফেলে, কিন্তু যেখানে বালির কিছুটা নিচেপাথরের চাটান (ছড়ানো বড় পাথর) থাকে সেখানে গর্ত খুঁড়লেস্বল্প পরিমাণ জল পাওয়া যায়। আদিগন্ত বালিপ্রান্তরে ওই সামান্য জলটুকুর মূল্যঅসামান্য। অভিজ্ঞ মানুষরা সকালবেলায় কিংবা বৃষ্টির পরদিন বালি হাতেকরে ছুঁয়ে বলে দিতে পারেন সেখানে কুঁই কাটা যাবে কি না ।

পুকুর কাটার জায়গা বাছবারসময়ে যে সেই জায়গার ভূপ্রকৃতি ও মাটির ঢাল সম্পর্কে বাংলাদেশেও সচেতনতা ছিল তা পুরোনপুকুর দীঘিগুলিকে মন দিয়ে দেখলে বোঝা যায়। পুকুরে কেবল আকাশ থেকে ঝরে পড়া জলই জমা হত না,আশপাশের অঞ্চল থেকে গড়িয়ে আসা জলও সঞ্চিত থাকত। যে নিকটস্থ জায়গার জল গড়িয়েপুকুরে এসে নামে হিন্দিতে সেই জায়গাকে বলে 'আগৌর'। মানভূম বীরভূমের উঁচুনিচু মাটিতেআগৌরের যেদিক থেকে জল গড়িয়ে আসবে তার উল্টো দিকে অর্থাৎজমির/ পুকুরের ঢালের দিকে উঁচু করে মাটির বাঁধ দেওয়া হত । অনেকে বলেন এ কারণেই এইসব অঞ্চলেজলাশয়কে বাঁধ বলে। সমতল/গাঙ্গেয়অঞ্চলে বৃষ্টিবার অনেক বেশি, জনবসতি ঘন—এসব জায়গায় মূলত ঝরেপড়াবৃষ্টির জলই পুকুর পূর্ণকরবার পক্ষে যথেষ্টে। তাছাড়া গাঙ্গেয় অঞ্চলে তো ছিলই ভূজলেরসহজলভ্যতা। ফলে এসব অঞ্চলের—বর্ধমান নদীয়া চবিবশ পরগণা-আদির পুকুরের চারপাশেই মাটির উঁচুপাড় বাঁধানো থাকত।

বরংপ্রচুর বৃষ্টিতে পুকুর যেন পাড় ভেঙে না ফেলে কিংবা চারপাশদিয়ে উপছে উঠে বিপর্যয় না ঘটায়, তাই পাড়ের কোন অংশে কিনারার নিচে খানিকটা জায়গা নালারমত করে কাটাথাকত। বিশেষত সেচপুকুরে এটা বেশি হত। এই মাটির প াড় তৈরির হিসেব থাকত— পুকুরযত গভীর তার পাড় ততো উঁচু। যে পাড় যতো উঁচু হবে গোড়ার কাছে সেটা ততো বেশি চওড়া। বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলেপুকুর কাটার মাটি দিয়ে গৃহস্থ একটা উঁচু ঢিবি বানাতেন,বন্যাকালের কদিন সেই ঢিবি তাঁদের আপৎকালীন আশ্রয় হত। (নববইয়ের দশকে শ্রীপান্নালাল দাশগুপ্তবোলপুর অঞ্চলে সামাজিক ভাবে এই প্রথাটি চালু করবার চেষ্টাকরেন। অন্ততঃ বোলপুর ব্লক-১এর তিনটি গ্রামে এই পুকুর কাটা মাটি দিয়ে 'পাহ াড়' বানিয়েতাতে গাছ লাগানোর কাজ সফল হয়। শ্রীমতী শ্যামলী খাস্তগীরসহ অনেকের ও গ্রামবাসীদেরঅক্লান্ত চেষ্টায় শ্রীদাশগুপ্তচেয়েছিলেন সেই 'পাহাড়ের ওপর একটি বা দুটি ইঁট গাঁথনির ঘর, টিউবওলের , শৌচাগারও ধর্মগোলা করে রাখা হবে। বন্যা ছাড়া অন্য সময়ে সেখানে গ্রামের স্কুল কিংবাচিকিৎসালয় চলবে। কিন্তু, এরকম হাতেরকাছে সহজসাধ্য ত্রাণ প্রচুর চালু হলে বৃহৎ রিলিফ শিল্প ইনডাসট্রিঅর্থে —মার খাবে। সুতরাং কোনোওপরতলা এই ব্যবস্থা টিতে আগ্রহ দেখান নি। টেগোর সোসাইটি অবশ্য এখনও চেষ্টা করেছেন ।

ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে পুকুরের এইপাড় যেমন ভর্তি পুকুরের জল গড়িয়ে লোকালয়ে ঢোকা আটকাত অন্যদিকেআবার আশপাশের অপরিষ্কার জল গড়িয়ে পুকুরে ঢোকাও বন্ধকরত। এই পাড়ের নিয়মিত মেরামতি ওরক্ষণ াবেক্ষণ করতে হত। তার অভাবে আজ আমরা গ্রাম-শহরে যেসবপুকুর দেখি সেখানে পাড়গুলি ভেঙে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে অথবা আশপাশেররাস্তা ও লোকালয় উঁচু হতে হতে পাড়ের সমান হয়েছে। ফলে ময়লা জল ওআবর্জনা অবাধে গড়িয়ে পুকুরে এসে নামে। বর্ধমান পুলিয়া হাওড়া কলকাতা যে কোন শহরের অবশিষ্টপুকুরগুলির দিকে তাকালেই এটা স্পষ্ট দেখা যায়।

ছায়ার ঘোমটা মুখেটানি
আছে আমাদের পাড়াখানি
দীঘি তার মাঝখানটিতে
তালবন তারিচারিভিতে

কীকী গাছ লাগানো হবে পুকুরপাড়ে নির্দ্দিষ্ট রীতি ছিল তারও । পূবদিকে কোন বড় গাছ থাকবে না, সকালেরসমস্ত রে াদটি যেন পায় পুকুর জলের আশ্রিতরা । সে জলে উদ্ভিদ ও প্রাণী দুইইভরভরন্ত, সূর্যালোক তাদের পুষ্টি। পাতা ঝরে যেসব গাছের সেগুলি পুকুরপাড়ে কাঙ্খিতগাছগুলির অন্যতম সে কথা 'তালপুকুর' বাগ্বিধিতেই প্রকাশ।

পুকুর তৈরির জায়গা বাছা, পাড়ঘেরা ও আসল কাজটি অর্থাৎ পুকুর খোঁড়া-সবকটি বোঝা যায় সামূহিক ক াজছিল। সমাজের অধিকাংশ মানুষেরপ্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগদান ছাড়া পুকুর তৈরি সম্ভব ছিল না। কেননা এমনকি কে ান রাজা বা ভূস্বামীর জমিতে, তাঁদেরঅর্থানুকূল্যে হলেও খোঁড়া কেবল একটি বস্তুগত কাজমাত্র ছিল না। তা ছিল একটা সংস্কৃতি। গ্রামজীবনের সঙ্গে এমন ওতপ্রোত থাকতদীঘি বা পুকুর যে তাদের মধ্যে গ্রামের স্থানীয় ইতিবৃত্ত, রীতিনীতি,আর্থ-সামাজিক অবস্থাও চিহিত থাকত। পুকুর খুঁড়বারসময়ে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় যেমন দেশের পবিত্র নদীগুলিকে আহ্বান জা নিয়েতাদের জল প্রার্থনা করা হত সেরকমই খনন ও সেই খনিত মাটি দিয়ে পাড়বাঁধা শেষ হবার পর, নিচ থেকে জল উঠবার পর পুকুরের'প্রাণ প্রতিষ্ঠা ' করা হত। অবশ্যই সব পুকুরের নয়, কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই হত। এই অসামান্য আচ ারথেকে আমরা আন্দাজ করতে পারিবাংলার সমাজ কী মানসিকতায় জলাশয়কে দেখত। প্রাণপ্রতিষ্ঠার কাজ করতেন ব্র াহ্মণরা ঠিকই,কিন্তু মুদি নামের এক সম্প্রদায়ের উপস্থিতি আবশ্যিক ছিল সেঅনুষ্ঠানে। মাটি খোঁড়ার কাজশুর মুহূর্তেও। খননের উপযোগীখন্তা কোদাল বেলচা তৈরি করতেন কামার ও আগর নির্মাতারা। মানভূমে এখনো আগুরীরা এক স ম্পন্নসম্প্রদায়। মাটি খোঁড়ার কাজেতিথি-নক্ষত্রের বিচার হলেও সাধারণভাবে জাতবিচার প্রাধান্য পেতনা। 'প্রাণপ্রতিষ্ঠ ার' মধ্য দিয়ে যে জলাশয়কেজীবনে বরণ করে নেওয়া হল সমস্ত মঙ্গলাচরণেই তার স্থান হত অগ্রগণ্য। বিয়ের দিন শেষ র াত্রিতে পুকুরেরজল সইতে যাওয়া থেকে যে কোন অনুষ্ঠানের শু কিংবা শেষের স্নান ছিল গ্রামের বিশেষ বিশেষপুকুরে। আত্মজনের মৃত্যু-অশৌচের শেষ আজও হয় পুকুরে 'ঘাট কামানো' 'ঘাটেওঠা' দিয়ে । তার চেয়েও সুন্দরআচার

পুকুরদেরও বিয়ে হত।অধিবাস হত। পুজো হত পুকুরের। যে কোন আনন্দ কি বেদনার ঘটনাকেস্মরণীয় করবার জন্য তৈরি হতপুকুর, দীঘি। সমাজের উদ্দেশ্যে জলাশয়দান গ্রামস্বামীদের জন্য নির্দিষ্ট পুণ্যকাজগুলির মধ্যে প্রধান ছিল। জনশ্রুতি আছে, অধুনা বাংলাদেশের যশোহরনৃপতির মা কালিঘাটের কালিদর্শনে এসেছিলেন। ফিরে গিয়ে রাজা-ছেলেকে বলেছিলেন ছায়াহীন দীর্ঘপথ ওজলকষ্টের কথা। ছেলে সমস্তপথের দুপাশে লাগান ছায়াত, খনন করেন অসংখ্য পুষ্করিণী। আজকের যশোররোডের পাশেপাশে আজও তার চিহ্নদেখা যায়। প্রজা সাধারণেরকল্যাণে অজস্র পুষ্করিণী কাটিয়ে ছিলেন প্রিয়দর্শী অশোক। সুবিবেচক সম্রাট শেরশাহ। বারো ভুঁইয়ার নামাঙ্কিত বহু দীঘিএখনও এদেশে আছে।

পুকুর খনন ও তারক্ষণাবেক্ষণের মূল দায়িত্ব এক সময়ে নিতেন ভূম্যধিকারীরা। সমাজের পাঁচজনা মিলেও যে কখনও সে কাজচালিয়ে নেননি এমন নয়। দেশেরস্বাধীনতার পর এই পরমসম্পদটি অবহেলিত হতে শু করল। গ্রামের পরম্পরাগত জ্ঞান ও অভ্যাসের যেবিপুল ভাণ্ডার তাকে একেবারে অগ্রাহ্য করে মুখ ফেরানো হয় পশ্চিমী'আধুনিকতা'র মডেলের দিকে। যে রাজ্য যত দ্রুত যত বেশি আধুনিক হল তারা ততো তাড়াতাড়িখোয়ালো নিজেদের শিকড়। জলসম্পদের উত্তরাধিকারমনে হয় সেই ক্ষতিগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান।

সমস্ত পৃথিবী আজ পুকুর দীঘিজলক্ষেত্রের দিকে ফিরছে। মাটিছেঁচে, নদী বেঁধে, মেবরফ গলিয়ে যে জলসমস্যা কেবল জটিলতর হয়ে উঠবে সেকথা প্রমাণিত। আমাদের দেশেপুকুরগুলি আমাদের পাড়া প্রতিবেশির মত। অবহেলা অবজ্ঞায় তাদের আমরা ক্রমে হারিয়েছি। পুকুরের জলকে ভেবেছি আপদ। ভেবেছি ভরাট হয়ে বহুতল বাড়ি তুলবারজায়গায় রূপান্তরণই পুকুরের একমাত্র সার্থকতা। কোন বড়সংস্থান যেমন একদিনে গড়ে ওঠে না, তেমনি তারঅভাবের লোকসান বোঝা যায় না একবারে। বিরাট জঙ্গল কেটে ফেলবার পরও মৃত গাছদের শিকড়গুলি যেমনকিছুদিন, কয়েকবছর পর্যন্ত মাটিকে ধরে রাখে, তারপরভূমিক্ষয় শু হয় পুকুরের বেলাওতাই। লক্ষ লক্ষ পুকুরেরসিঞ্চন মাটিকে যে সরসতা দিয়েছিল পুকুরগুলির দ্রুত অন্তর্ধানেরপরও তৎক্ষণাৎ সে নির্জল বোঝাযায়নি। ধীরে ধীরে মাটি শুকনো শ্রীহীনহয়েছেন, ঘাস গুল্ম বাঁশঝাড় শুকিয়েছে। তারপর আজ বন্যার প্রলয়ঙ্করী রূপ প্রকটহচ্ছে।

এই সময় যখন আমাদেরপুকুরগুলিকে আবার খুঁজতে হবে। বুঝতে হবে পুকুর রক্ষা করা, পুকুর তৈরি করা শুধুএক যান্ত্রিক কর্মকাণ্ড নয়। এ এক জীবিতজটিল বিচিত্র সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা, যার প্রাণকে ছুঁতে নাপারলে আমরা কখনো সার্থকতার দিকে যাব না। গবেষকের কুশলতার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে ছাত্রের সাগ্রহ শ্রদ্ধা।

এই শ্রদ্ধা আর ভালোবাসাটুকু মাত্রসম্বল করে আমি পুকুর খুঁজবার পথটি দেখতে চাইছি। সেই ভালোবাসাটুকু মাত্র সম্বল করে আমিপুকুর খুঁজবার পথটি দেখতে চাইছি। সেই ভালোবাসাই এ লেখা লিখবারসাহস জুগিয়েছে, এই ভরসায় যে শহরের নবীনরা আসবেন গ্রামেরপ্রবীণতারকাছে। পানা সরিয়েযেমন করে পৌঁছতে হত জলে তেমন করেই একপক্ষের অনভ্যাসআড়ষ্টতা, অন্য পক্ষের বিস্মৃতি, আত্মবিশ্বাসহীনতা সরিয়ে জলময়সেই সত্যের কাছে পৌঁছনো যাবে কাল যার মুখ আবৃত করেছেন ।

(এ লেখা কখনও লিখতে পারতাম না, যদি শ্রীঅনুপম মিশ্রের 'আজ ভী ঘরে হ্যায়তালাব' বইটি নিত্য সাহস না দিত।)

লেখক পরিচিতি— গল্পকার,প্রাবন্ধিক, পরিবেশ আন্দোলনের অন্যতম শীর্ষনাম ।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com